International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 421-427
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.236

একবিংশ শতাব্দীতে লিঙ্গ সমতার প্রাতিষ্ঠানিকতা বনাম বাস্তবতার একটি অনুসন্ধানমূলক সমান্তরাল বিশ্লেষণী চিত্রায়ন

প্রচেতা চৌধুরী
স্বাধীন গবেষক, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Even in the present era, gender inequality is like an epidemic in the heart of India. Efforts to establish gender equality in Indian society have been going on since ancient times. The constitution of independent India also mentioned in various clauses the plea for gender equality, but it did not create much of a stir in the Indian society. A discriminatory picture of physical and mental violence against women can be seen everywhere in society. The question that is relevant in this regard is where these root causes of gender inequality originate. The main aim of this study is to understand the way to solve this gender inequality, and create social awareness about the importance of establishing gender equality not only institutional terms but also in practical terms. Basically, quantitative method has been used in this research. Basically, it has been shown through this research that in some areas, legal protections are successful in establishing gender equality and in some cases, despite the existence of legal protections, the absence of gender equality in reality exists deeply.

Looking at the present situation, it is easy to understand that even if gender equality has been institutionalized, but in reality, it is not established. It is absolutely necessary to completely change the mentality of the entire mankind. The significance of this research paper lies in raising awareness about the need to create a liberal mentality at all levels in the society in order to establish the concept of gender equality on the ground.

Keywords– Gender equality, Domestic violence, Patriarchy, Women empowerment, Women's rights, Capacity building.

'জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি' ও 'জেন্ডার ইকুয়ালিটি' নিয়ে আলোচনার বৃহত্তর পরিসরের প্রাথমিক ক্ষেত্রে জেন্ডার শব্দটির আক্ষরিক অর্থ সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণার উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। আভিধানিক অর্থে 'sex' আর 'Gender' এই শব্দ দুটি সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এই শব্দ দুটির আভিধানিক প্রতিশব্দ হলো লিঙ্গ। কিন্তু বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে দিনের আলোর মতন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে 'Gender' এবং 'Sex' এর একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। মূলত 'Sex' হলো মানুষের জন্মগত লিঙ্গ পরিচয় অপরদিকে 'Gender' হলো মানব সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গড়ে ওঠা লিঙ্গ পরিচয়। 'লিঙ্গ- বৈষম্য' ও 'লিঙ্গ-সাম্য' আপাত দৃষ্টিতে এই শব্দ দুটির মধ্যে লিখনগত বা শব্দগত পার্থক্য শুধুমাত্র একটি অক্ষরের কিন্তু বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করলে বোঝা যায় এই পার্থক্য আসলেই অনুমেয়হীন।

মানব সভ্যতার বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীদের সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে তথা সামাজিক মান মর্যাদার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বৈষম্য লক্ষণীয়। বৈদিক যুগের আদিপর্বে নারীদের সামাজিক মর্যাদা ছিল উচ্চ স্থানীয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গার্গী নামক নারী ঋকবেদের শ্লোক রচনা করেছিলেন যা থেকে নারীদের ও যে সমাজে গুরুত্ব দেওয়া হতো তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থার অবনতি ঘটে। নারীদের অবস্থার অবনতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ দৃষ্টিগোচর হয় "মনুস্মৃতি" নামক গ্রন্থে। মনুস্মৃতি অনুযায়ী নারী শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী,বার্ধক্যে পুত্রের অভিভাবকত্বে থাকবে।মহাভারতের আদি পর্বেও বলা রয়েছে কন্যা হল দুঃখের এর কারণ। পরবর্তী ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা ভারতে নারীদের কে যেন আরও অন্ধকারময় জগতে আবদ্ধ করে দিয়েছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই অদৃশ্য অন্ধকারের বেড়াজাল আরো দৃঢ় হয়েছিল পর্দা প্রথা, বাল্যবিবাহ, বোরখা প্রথা ও বহুবিবাহ প্রথার মাধ্যমে। অন্ধকার এই বেড়াজাল ভেঙে নিজেদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার লড়াই নারীর বহুদিনের যা বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতেও প্রবাহিত এক গতিধারা।

নারীদের করুন অবস্থার সূচনা প্রায় বৈদিক যুগ থেকেই এ কথা বলা চলে। তবে বৈদিক যুগ থেকে নারীদের অবস্থা বিশ্লেষণ করার আগে এ কথা জানা প্রয়োজন প্রাচীন ভারতের পিতৃতান্ত্রিকতার উৎপত্তি ঠিক কিভাবে হয়েছিল। দীর্ঘ ইতিহাসের দিকে দিকে তাকালে দেখা যায় প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল মূলত মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা। পরবর্তী ক্ষেত্রে আর্যরা ভারতের এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়ে তৈরি করেছিলেন পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এবং এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎপত্তির সাথে সাথেই নস্যাৎ হয়ে পড়ে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা যার ফলে নারী স্বাধীনতা নিমজ্জিত হয় অস্তগামী সূর্যের আলোকের মতন। এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব হয়েছিল মূলত সন্তান এবং সম্পদ এই দুটি বিষয়ের উপর স্থায়ী মালিকানা স্থাপনের জন্য। সুতরাং, একথা বলাই বাহুল্য যে মাতৃতান্ত্রিকতাকে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রাচীন যুগে যে পিতৃতান্ত্রিকতার উদ্ভব হয়েছিল সেই পিতৃতান্ত্রিকতার বেড়াজাল থেকে সামান্য মুক্তি ঘটলেও সম্পূর্ণভাবে নারী মুক্তি বা নারী স্বাধীনতা যা মাতৃতান্ত্রিক সমাজে উপস্থিত ছিল তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা আজও সম্ভব হয়নি এবং সম্ভব হয়নি বলেই নারীরা আজও লড়াইয়ের ময়দানে অনবরত লড়াই করে চলেছেন নিজেদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য, নিজেদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য।

বৈদিক যুগে নারীদের সব থেকে করুণ চিত্র দেখা যায় সন্তানের জন্মদান সংক্রান্ত ক্ষেত্রে। নারীদের কোন মতামত এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতো না এবং সবথেকে কঠিন পরিস্থিতি ছিল নারীদের উপর এককভাবে মানসিকভাবে চাপ সৃষ্টি করা হতো পুত্র সন্তান প্রসবের জন্য যা কখনোই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রযোজ্য নয়। শুধুমাত্র পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্যই যেন নারীর জন্ম। কন্যা সন্তানের জন্ম কে অত্যন্ত অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হতো। শুধুমাত্র নবাগতা কন্যা শিশুকেই নয়, তার জন্মদাত্রী মা কেও অবহেলার স্বীকার হতে হতো। সমাজের সবচেয়ে করুণ দৃশ্যটি দেখা যেত যখন কোন নারী পুত্র সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম হতেন তাহলে, তার পরিবর্তে সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করে পুরুষ আবার বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হতেন এবং এর জন্য বিভিন্ন বিধান বিভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে উল্লেখিত ছিল।

শুধুমাত্র সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রেই যে নারীদের মতামত গ্রহণযোগ্যতা ছিলোনা তা নয়। বিবাহের ক্ষেত্রেও নারীর মতামতকে কোন ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হতো না তা বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্য থেকে জানা যায়। কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা বাদে নারীর ভাগ্য সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হতো পিতৃতান্ত্রিকতা দ্বারা। বৈদিক শাস্ত্র কে মেনে নিয়ে যে সমস্ত রীতিনীতি ভারতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে রয়েছিল সেগুলোতে সমস্ত ক্ষেত্রে ছিল পুরুষের প্রাধান্য এবং এই সমস্ত নিয়মকানুন এর মাধ্যমে হীন করা হতো নারীর আত্মমর্যাদা কে। এরকমই একটি রীতি হল

কন্যাদান যেখানে কন্যার পিতা অথবা কোন পিতৃস্থানীয় ব্যাক্তি কন্যাকে পণ ও যৌতুক সহ দান করেন তার স্বামীর কাছে। এই সম্প্রদানের মাধ্যমে কন্যা কে এক প্রকার বস্তুতে পরিণত করা হয়। এমনকি বিবাহিত নারীদের ক্ষেত্রে নিজেদের যৌন জীবনের কোন স্বাধীনতা তাদের ছিল না। বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে নারীর স্বামী ছিলেন তার যৌন জীবনের নিয়ন্ত্রক, স্ত্রীর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য ছিল না তাদের কাছে। এবং নারীদের সব থেকে করুন অবস্থার শিকার হতে হতো পুরুষের বহুবিবাহের ব্যবস্থার জন্য। ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত বৈদিক সাহিত্যেই পুরুষদের বহু পত্নীর কথা উল্লেখ রয়েছে। মৈত্রায়িনী সংহিতা অনুসারে মনু তার দশ জন পত্নীর গর্ভে পঞ্চান্ন টি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো বৈদিক সাহিত্যে এগুলির বিবরণ এমন ভাবে রয়েছে যেন বিষয়টি অত্যন্ত গর্বের। সুতরাং, এ কথা বলা যায় নারীর শারীরিক এবং মানসিক সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রন ছিল পুরুষ জাতির হাতের সুতোতে বাঁধা। নারীরা চাইলেই সেই সুতো ছিন্ন করে নিজেদের মতো স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারতেন না। বৈদিক সমাজের এই চিত্র দেখে সহজেই বলা যায় যেখানে নারীদের নিজেদের শরীরের ওপরই নিজেদের কোন অধিকার ছিল না সেক্ষেত্রে নারীদের নিজেদের মানসিক চিন্তাভাবনার উপর যে নারীদের কোন অধিকার থাকবে বা তাদের চিন্তাভাবনা বা তাদের মানসিক অবস্থার কথা যে সমাজে কোনভাবেই গ্রহণযোগ্যতা পাবে না তা বলাই বাহুল্য। তারা কেবলমাত্র পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চাহিদা পূরণ করার জন্য যন্ত্রের মতন বেঁচে থাকতেন। এমনকি দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে নারীরা যে পুত্রসন্তানের জন্ম দিতেন তাও তাদের নিজেদের জন্য নয়। এমনকি যদি কোন ব্যক্তির শুধুমাত্র কন্যা সন্তান থাকতো তাহলে তার বংশ রক্ষার দায়িত্ব পড়তো সেই কন্যা সন্তানের পুত্র সন্তানের ওপর । অর্থাৎ নারীকে শুধুমাত্র বংশ রক্ষা করার এক বৈধ উপায় হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে সেটা তার স্বামীর বংশ হোক অথবা তার নিজের পিতার বংশ।

বৈদিক যুগে তথা প্রাচীন ভারতে যে নারীর মর্যাদার অবনমন শুরু হয়েছিল সেই পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও আজও প্রকাশ্য দিবালোকেই নারীর মর্যাদার অবনমন ঘটে চলেছে অহরহ। সেই কারণেই অন্ধকারময় 200 বছরের ব্রিটিশ শাসনের অধীনতা থেকে মুক্তির 75 বছর পরেও আজও বর্তমান সমাজের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে লিঙ্গ সাম্যের আলোচনার প্রেক্ষাপটে যে মূল প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হলো লিঙ্গ বৈষম্যের মূল শেকড় কোথায়? কারন লিঙ্গ বৈষম্যের মূল শেকড় এর অনুসন্ধান লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত ভারতবর্ষের সংবিধানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে নারীদের উন্নয়ন ও সুরক্ষা এবং সম মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধারা এবং আইন উল্লেখিত থাকা সত্ত্বেও নারী সমাজের করুণ অবস্থার প্রতিচ্ছবি বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে সমাজের পিতৃতান্ত্রিকতার ঘেরাটোপের আয়নায় স্পষ্টতই প্রতিয়মান হয়ে ওঠে বারংবার।

প্রখ্যাত নারীবাদী তাত্ত্বিক সুসান মোলার ওকিন তার "জাস্টিস জেন্ডার এন্ড দ্যা ফ্যামিলি" পুস্তকে লিঙ্গ বৈষম্যের মূল কারণ হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন পরিবারকে। ভারতবর্ষের সমাজের দিকে তাকালে এই বিষয়টি প্রতিবিম্বের মতো উপস্থিতি লক্ষণীয়। বৈদিক যুগের রেশ ধরেই বলা যায় বৈদিক যুগে যেমন নারীকে পুত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে দেখা হতো বর্তমান সমাজেও এই চিত্র যে একেবারেই দৃষ্টিগোচর হয় না তা নয়। বর্তমান সমাজেও অনেক ক্ষেত্রে পরিবার থেকে নারীর উপর মানসিকভাবে চাপ আসে পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার এবং এই চাপের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই জন্ম পূর্ববর্তী গর্ভ নির্ধারণের বিরুদ্ধে আইন থাকলেও সেই আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে জন্মের পূর্বেই করা হয় লিঙ্গ নির্ধারণ এবং এর সবচেয়ে মারাত্মক ফল হলো কন্যা ভ্রূণ হত্যা। যা এখনো ভারতবর্ষের সমাজে বেআব্রুভাবে উপস্থিত। ভারতবর্ষের সমাজে প্রচলিত একটি নৃশংস প্রথা হলো কন্যা ভ্রুণ হত্যা যা দৃঢ়ভাবে লিঙ্গ বৈষম্যকে নির্দেশিত করে। আশঙ্কা জনক বিষয়

হলো 1994 সালে কনসেপশন এবং প্রি-নাটাল ডায়াগনস্টিক টেকনিকস আইন পাশ হয়েছিল জন্ম পূর্ব লিঙ্গ নির্ধারণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধের জন্য। কিন্তু তৎ সত্ত্বেও পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী 2000 থেকে 2019 এর মধ্যে প্রায় 9 মিলিয়ন কন্যা ভ্রূণ হত্যা সাধিত হয়েছে যা নারীদের জন্ম পূর্বের সহিত জন্ম পরবর্তী সুরক্ষার ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উত্থাপন করে দেয়। যেখানে ভারতবর্ষের সংবিধানের 21 নম্বর ধারায় উল্লেখিত রয়েছে "জীবনের অধিকারের" কথা ঠিক সেই ক্ষেত্র কে বালির ঝড়ের মতন নস্যাৎ করে দিয়ে জন্মের আগেই জীবনের অধিকার কে যেভাবে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তা কোনভাবেই কাম্য নয়।

লিঙ্গ বৈষম্যের অন্য আরেকটি দিক হলো পারিবারিক হিংসা। পারিবারিক হিংসার একটি ঘৃণ্যরূপ বাল্যবিবাহ। মেয়েদেরকে বোঝা বলে মনে করা এবং জোরপূর্বক তাদের বিবাহ সম্পন্ন করানো এ যেন এক অবৈধ অথচ বৈধ রীতি হিসেবে পরিণত হয়েছে সমাজের বুকে। যদিও 2006 সাল থেকে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ আইন এবং এর পূর্বে বাল্যবিবাহ দমন আইন 1921 থেকে ভারতবর্ষের বুকে বিরাজমান তার পরেও বাল্য বিবাহের সম্পূর্ণ অবসান ঘটেনি। ব্যাঙ্গর্থে বলা যেতে পারে বাল্যবিবাহের একটি পরিণত রূপ হলো প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ। প্রাচীন যুগে যেমন জোরপূর্বক নারীর বিবাহ দেওয়া হতো তেমনই বর্তমান যুগেও অনেক ক্ষেত্রে নারীদের মতামত বিরুদ্ধ ভাবে জোরপূর্বক বিবাহ দিয়ে দেওয়া হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রাচীন যুগে যেমন নারীদের যৌনজীবনের প্রতি তাদের নিজেদের কোন অধিকার থাকতো না অথবা যৌনজীবনের ক্ষেত্রে নারীরা যেমন নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারতো না ঠিক একইরকম ভাবে তারই একটি আধুনিক প্রকাশ হচ্ছে ম্যারিটাল রেপ অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমান যুগেও নারীরা এই একই ধরনের হিংসার শিকার হয়ে থাকেন শুধুমাত্র পরিবর্তন হয়েছে এর পোশাকি নাম, যা এই বিবাহ নামক পবিত্র বন্ধনকে কলুষিত করেছে। এই বিবাহ নামক পবিত্র বন্ধনকে কলুষিত করেছে আরেকটি বেআব্রু প্রথা যা হল পণপ্রথা। 1961 সালে যেমন পণপ্রথা নিষিদ্ধ আইন এসেছে তেমনি 42 তম সংবিধান সংশোধনীতে 51 (1) অর্থাৎ মৌলিক কর্তব্যের মধ্যে দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে নারী জাতির মর্যাদা হানিকর সকল প্রথা পরিহার করতে হবে । কিন্তু তা সত্ত্বেও পণপ্রথা স্বমহিমায় প্রবাহিত নদীর মত শান্তভাবে সমাজে বিরাজমান কিন্তু যখন সেই নদীতে জোয়ার আসে সেই জোয়ারের প্লাবনে একটি নারীর জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। NCRB এর রিপোর্ট অনুযায়ী নারীর বিরুদ্ধে 2017 তে অপরাধের সংখ্যা ছিল 8600 টি সেই সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে ক্রমবর্ধিত হয়ে 2019 এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে 4.05 লক্ষ, যা অত্যন্ত হতাশা জনক। এর মধ্যে 1.26 লক্ষ ছিল পারিবারিক হিংস্রতার ঘটনা। জাতীয় মহিলা কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে লকডাউন হওয়ার পর থেকে এই ঘটনা 2.5 গুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে তার কারণ হিসেবে উঠে এসেছিল পুরুষদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মাদক দ্রব্যের ব্যবহার।

লিঙ্গ বৈষম্যের প্রভাব পড়তে দেখা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রেও NFSH -5 (2019-2021) এর রিপোর্ট অনুসারে মহিলাদের সাক্ষরতার হার যেখানে 83.0% সেখানে পুরুষদের সাক্ষরতার হার 89.6%। অথচ ভারতীয় সংবিধানের 86 তম সংশোধন অনুযায়ী 6 থেকে 14 বছর বয়স অবধি সমস্ত শিশুর শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে 21(1) ধারা অনুযায়ী। কিন্তু বাস্তব চিত্রে দৃষ্টি গোচর হচ্ছে যে এই আইন কেবলমাত্র লিখিত দস্তাবেজে বন্দী হয়ে থেকে গেছে বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক আগ্রহ নিতান্তই নগণ্য।

লিঙ্গ নির্বিশেষে যে কোন শিশুর শিক্ষার্জনের একটি মূল উদ্দেশ্য থাকে স্বনির্ভর হওয়া। লিঙ্গ নির্বিশেষে শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে আইন থাকা সত্ত্বেও যেখানে বৈষম্য বিদ্যমান সেখানে খুব স্বাভাবিকভাবে জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রেও বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। যদিও সম হারে বেতন আইন 1978 সাল থেকেই ভারতবর্ষে রয়েছে তবুও The Hindu পত্রিকার একটি রিপোর্ট অনুসারে জেন্ডার ওয়েজ গ্যাপে ভারতবর্ষের স্থান 2024-এ ছিল 129 এ সেখান থেকে 2025 এ ভারতবর্ষে স্থান হয়েছে 131 এ যা অত্যন্ত হতাশা জনক। এখান

থেকেই ভারতবর্ষের নারী ও পুরুষের বেতন বৈষম্যের যে রূঢ় দিক তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এবং সে ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের 39(d) ধারা যেখানে উল্লেখিত রয়েছে সমকাজে সমবেতনের কথা নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমে তা যে লঙ্ঘিত হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। এছাড়াও ভারতীয় সংবিধানের 23 (a) নম্বর ধারা অনুযায়ী বেগার খাটানো অথবা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করানো বা বলপূর্বক কাজ করানো নিষিদ্ধ হলেও ভারতবর্ষের পরিবারগুলিতে একটি খুব সাধারণ চিত্র ফুটে ওঠে। নারীরা তাদের জীবন পাত করে সারাদিন রাত অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেন তাদের সংসারের জন্য। শুধুমাত্র গৃহবধূ রাই নন অনেক ক্ষেত্রে চাকুরীরতা মহিলাদেরও সংসার ও কর্মস্থল উভয়ই একসঙ্গে সামলাতে হয় নইলেই তাদের জন্য বরাদ্দ থাকে কিছু ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতন কিছু ক্ষেত্রে মানসিক নির্যাতন অথবা কিছু ক্ষেত্রে মৌখিক নির্যাতন যা ভারতবর্ষেরসংবিধানের পরিপন্থী। সুতরাং খুব পরিষ্কার ভাবে এ কথা বলে যাই ভারতবর্ষের সংবিধানসহ বিভিন্ন আইনের ক্ষেত্র দ্বারা লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হলেও তা বাস্তবে খুব বেশি সফলতা লাভ করেনি।

তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও যেমন লিঙ্গ বৈষম্য বিদ্যমান ঠিক তেমনি সমান্তরালভাবে কিছু ক্ষেত্রের ওপর আলোকপাত করলে দেখা যায় যে লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও আশার আলো সঞ্চারিত হয়েছে এবং সেই আলোর বিচ্ছুরণ আলোকিত করেছে সমগ্র সমাজকে। লিঙ্গ বৈষম্য যেখানে স্বমহিমায় ভাস্বর সেখানে ভারতের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু যেন লিঙ্গ সাম্যের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ভারতে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্তরে সরকারের উদ্যোগ হিসেবে 1993 এবং 1994 সালে পঞ্চায়েত এবং পৌরসভার ক্ষেত্রে মহিলাদের আসন সংরক্ষণের নিয়ম এবং 106 তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে লোকসভায় মহিলাদের এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের নিয়ম অনেকটাই সাহায্য করেছে।

সংবিধানের 39 (a) নম্বর ধারা অনুযায়ী যেখানে নিজের ইচ্ছেমত জীবিকা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে সেক্ষেত্রে আজ সক্ষম বহু নারী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পূর্বে সামরিক ক্ষেত্রে নারীদের যোগদান কম হলেও বর্তমানে তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার উদাহরণ হিসেবে অদূর অতীতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশন সিঁদুরের নেতৃত্বে স্বমহিমায় ভাস্বর ছিলেন দুজন নারী। অর্থাৎ সমাজের অভ্যন্তরে লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার যে বিজয় ধ্বনি তা প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করেছে সমাজের অন্তরীনে যা একদিন বৃহৎ কোন পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে অর্থাৎ যা একদিন লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে এই সম্ভাবনা তে আশার আলো সঞ্চার করছে একথা বলা যায়।

তবে বলা বাহুল্য গবেষণাপত্রের মূল যে প্রশ্ন তার উত্তরের দিশা পেতে গিয়ে এ কথা স্পষ্টত প্রতিয়মান, মানুষের এই লিঙ্গ বৈষম্যের মূল শেকড় নিহিত রয়েছে সমাজে এবং সমাজ মূল একক পরিবারের মননে এবং চিন্তনে। প্রকৃতির সাধারন নিয়মে নারী এবং পুরুষ একে অপরের পরিপূরক একথা অনস্বীকার্য । কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এক সাথে বেড়ে ওঠা ভাই বোনের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য এর সূত্রপাত করে থাকেন বাড়ির অভিভাবকরাই। একসাথে খেতে বসলে হয়ত বড় মাছের টুকরো টি তুলে দেওয়া হয় বাড়ির পুরুষ দের থালাতে। অনেক ক্ষেত্রেই আজও বাড়ির মহিলা মহল খেতে বসেন বাড়ির সকল পুরুষদের খওয়া সম্পন্ন হওয়ার পর, তাছাড়াও এখনও অনেক পরিবারে দেখা যাই ঘরের সমস্ত কাজ মহিলারা করছেন এবং পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের কন্যা সন্তানটিকেও সেই ভাবে গড়ে তোলা হয়ে থাকে। এর ফলস্বরুপ নারীরাও যুগ যুগ ধরে এই পিতৃতান্ত্রিকতার অদৃশ্য বেড়াজাল কে নিজের মনে পালন করে চলেছেন ও তার প্রতিফলন ঘটিয়ে চলেছেন পরবর্তী প্রজন্মের কন্যা সন্তানটির মধ্যে দিয়ে। আশ্চর্যের বিষয় হল এই পিতৃতান্ত্রিকতার জাল

সরাসরি যতটা না বুনন করেন পুরুষরা তার থেকে অনেক বেশি সুকৌশলে এই জাল বুনন করানো হয় নারীদেরই মাধ্যমে নারীদেরই মননে, চিন্তনে। যার ফলস্বরুপ নারীরা খুব সহজে পিতৃতান্ত্রিকতার বেড়াজাল থেকে সম্পূর্ণ রুপে মুক্ত হতে পারেন না। তবে বর্তমান যুগে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক নারী এই বেড়াজাল ছিন্ন করে নিজেকে গড়ে তুলেছেন স্বয়ং সম্পূর্ণ হিসেবে আর ঠিক এখানেই সঞ্চারিত হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিকতা থেকে নারীর মুক্তির এক অভিনব দিক নির্দেশ। মানুষের মননে এবং চিন্তনে লিঙ্গ বৈষম্যের যে বীজ আরোপিত রয়েছে যার সমূলে উৎপাটন সম্ভব মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন হলে এবং লিঙ্গ সাম্য কে গ্রহন করার মতন উদার মানসিকতা, মনন ও চিন্তন এর উদ্রেক হলে। যা সম্ভব হবে শিক্ষার আলোকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ও লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা যে কতটা গুরুত্ব পূর্ণ সেই বিষয়ে সচেতনতা জাগরনের মাধ্যমে।

এই অনুসন্ধানমূলক পর্যালোচনার পর সমাজে লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এবং লিঙ্গ বৈষম্যকে দূর করার ক্ষেত্রে যে যে পদক্ষেপগুলি স্বাভাবিকভাবে নেওয়া যেতে পারে সেগুলি হল-

১. শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষা নয়, প্রথাগত শিক্ষার বাইরে সমস্যা ভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ মানুষকে সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে এবং সেই সমস্যার সমাধান কিভাবে সম্ভব সেই সম্পর্কে তাদের শিক্ষা দিতে হবে।
২. কোন কোন স্থানে কোন সমস্যা বেশি তা চিহ্নিত করে সেটার ভিত্তিতে সেই নির্দিষ্ট জায়গায় সচেতনতামূলক প্রচার চালাতে হবে।
৩. নারীদেরকে নিজেদেরকে বুঝতে হবে তাদের নিজেদের কি সমস্যা এবং সেই সমস্যা নিয়ে নিজেদের কে সচেতন হতে হবে ও প্রতিবাদ করতে হবে।
৪. শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন হলে নারীরা সেটাকে সামান্য বিষয় না ভেবে তার বিরুদ্ধে আইনি সাহায্য নিতে পারেন সেই বিষয়ে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে।
৫. নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কি ধরনের আইন রয়েছে বা সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত নারীদের কি ধরনের অধিকার দেওয়া হয়েছে নিজেদের সুরক্ষার জন্য সেই বিষয়ে তাদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে।

পরিশেষে, এ কথা বলা যায় স্বাধীনতার 75 বছর পরেও লিঙ্গ বৈষম্যের অস্তিত্ব অত্যন্ত লজ্জা জনক যে লজ্জা মূলত সমাজ দ্বারাই সৃষ্ট, এবং এটি প্রমান করে যে সংবিধানের ধারা হোক অথবা কোনও আইন তা আজ ও প্রাতিষ্ঠানিক রুপেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরাজমান। এই লিঙ্গ বৈষম্যের মূল উৎপত্তি যেহেতু সমাজে এবং মূলত সমাজের মূল একক পরিবারের মধ্যে তাই সমগ্র সমাজের উচ্চ স্তর থেকে নিম্নস্তরের মানুষের মানসিক মননের, চিন্তনের এবং সমাজ বুননের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা পরিবর্তন হওয়া আবশ্যিক, এবং এর সাথে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রয়োজন নারীদের নিজেদের মন মানসিকতার পরিবর্তন। পিতৃতান্ত্রিকতার আচ্ছন্নময় পরিবেশ থেকে নারীদের নিজেদের মনকে আগে স্বাধীন করতে হবে তবেই নারীরা তাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠতে পারবেন। সমাজে একজন স্বতন্ত্র মানুষ হিসাবে নারীদেরকে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে কোন লিঙ্গ পরিচয় এর ভিত্তিতে নয়, শুধুমাত্র মানুষ হওয়ার অধিকারের ভিত্তিতে। নারীদের এই কঠোর পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি সমাজের লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য। সুতরাং, একথা অনস্বীকার্য লিঙ্গ সাম্যকে সাদরে গ্রহণ করা ও তাকে পূজন করা ও তাকে বুনন করা সর্বোপরি লিঙ্গ সাম্য কে লালন করা ও লিঙ্গ বৈষম্য কে সমূলে উৎপাটন করার জন্য সমগ্র সমাজের তথা নারী এবং পুরুষ জাতি উভয়েরই দৃঢ়, উদার মানসিকতা ও চিন্তাশক্তি তৈরি হওয়া অনিবার্য । তবেই, ভবিষ্যতে লিঙ্গ- সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হবে এবং একই সঙ্গে এই সম্ভাবনাও তৈরি হবে যে, সংবিধানসহ বিভিন্ন আইন গুলি লিখিত

দস্তাবেজ রুপে না থেকে, আকাশ কুসুম পরিকল্পনার বেড়াজাল ভেঙ্গে, প্রাতিষ্ঠানিকতা পরিত্যাগ করে, বাস্তবে সেই আইন গুলির ও সংবিধানের ধারা গুলির সফলভাবে রূপায়িত হওয়ার এক দৃঢ়, প্রশস্ত পথের উন্মুক্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা জাগরিত হবে।

তথ্যসুত্র:

১. মন্ডল, সমীর। নারীর নিরাপত্তা: ঘরেওবাইরে। মন্ডল, জয়প্রকাশ, (সম্পাদিত)। মানবীবিদ্যা চর্চা। দক্ষিণ ও দক্ষিণ– পূর্ব এশিয়ার অভিমুখ, এভেনেলপ্রেস, 2021।

২. ঘোষ, অরুণাভ। ভারতীয় রাজনীতির বিতর্কিত বিষয়। প্রগ্রেসিভপাবলিশার্স, 2010।

৩. অধিকারী, শ্যামলী। নারী ও পারিবারিক হিংসা: ভারতীয় আইন ও অভিজ্ঞতামূলক পর্যালোচনা। মন্ডল, জয়প্রকাশ, (সম্পাদিত)। মানবীবিদ্যাচর্চা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ– পূর্ব এশিয়ার অভিমুখ, এভেনেলপ্রেস, 2021।

৪. বসু, রাজশ্রী। চক্রবর্তী, বাসবি, সম্পাদিত। প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা। উর্বিপ্রকাশন, 2008

৫. মন্ডল, জাকিরহোসেন। প্রতিষ্ঠানে নারী: অতীত থেকে আজ। মন্ডল, জয়প্রকাশ, (সম্পাদিত)। মানবীবিদ্যাচর্চা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ– পূর্ব এশিয়ার অভিমুখ, এভেনেলপ্রেস, 2021।

৬. The Constitution of India, Article 12-35,39(a),39(d),51(a).

৭. মন্ডল, সুভাষচন্দ্র। নারীর সামাজিক অবস্থান: তত্ত্ব ও দর্শনের আলোকে। মন্ডল, জয়প্রকাশ, (সম্পাদিত)। মানবীবিদ্যাচর্চা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ– পূর্ব এশিয়ার অভিমুখ, এভেনেলপ্রেস, 2021।

৮. ভট্টাচার্য, সুকুমারী। প্রাচীন ভারতে নারী। বিশ্বাস অনিমা (প্রকাশক)। নারীবিশ্ব, জয়শ্রী প্রেস 91/1 বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা 700009, জুলাই, 2002।

৯. সিংহ, কঙ্কর। ধর্মওনারী প্রাচীন ভারত। রেডিক্যালইম্প্রেশন, 2017।

১০. https://mohfw.gov.in/sites/default/files/NFHS-5_Phase-II_0.pdf

১১. https://en.wikipedia.org/wiki/Female_foeticide_in_India

১২. https://www.thehindu.com/news/national/india-gender-gap-rank-global-gender-gap-index-2025-world-economic-forum/article69685804.ece